৫০ বছর পায়ে পায়ে
মল্লিক সু হাউস
ত্রিবেণী বাজার, হুগলী

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ -৪ | সংখ্যা ৪ | জুলাই-আগস্ট / ২০০৭ | RNI No. WBBEN/03/11192 | দাম ১টাকা

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন---
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

ডাইনি প্রথা আজও থামেনি

আমরা একবিংশ শতাব্দীর মানুষ। মানুষ এখন আকাশ পাড়ি দিচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু আজও আমরা আমাদের মন থেকে সংস্কারের বেড়া জালকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করতে পারিনি। বিভিন্নরকম কুসংস্কার আমাদের উন্নতির পথে কালা পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ডাইনি প্রথা একমই একটি কুসংস্কার।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাইনি প্রথা এক অন্যতম যন্ত্রণাদায়ক কুপ্রথা। এই প্রথার কবলে পরে অনেক নিরীহ, নিরপরাধ সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। বহু পরিবারকে একঘরে হতে হয়েছে। প্রধানত মহিলারা এই প্রথার শিকার। বহু মহিলাকে ডাইনি অপবাদে সহ্য করতে হয়েছে নৃশংস অত্যাচার। সমাজের সবরকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে।

কোনো এলাকায় যদি নানাকারণে ক্রমশঃ কোনও ক্ষতি হতেই থাকে অথবা কোনও মহামারীর জন্য বহু লোকের মৃত্যু ঘটতে থাকে, তবে এলাকার লোকেরা জানগুরু বা সকা নামক হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজ অথবা তন্ত্রসাধকদের শরণাপন্ন হয়। এই সুযোগে সরলমনা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এরা বহু অর্থের

এর পর ৫ পাতায়

জলাভূমির জীবনদর্শন : প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ

কোলকাতা থেকে প্রধানত মুম্বাইগামী জাতীয় সড়কের (NH-6) দু'পাশে প্রচুর হোগলা বন আছে। কোলকাতা থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত রাস্তার পাশে জন্মানো এই হোগলা বনে জন্মানো হোগলা, জলের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০-২৫ ফুট পর্যন্ত হতে দেখা যায়। প্রায় ২০,০০০ এরও বেশী মানুষ পশ্চিমবাংলায় হোগলা নির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। ছই, মাদুর, চা টাই, টোকা, সারসি ইত্যাদি তৈরি হয় হোগলা পাতা থেকে। মাদুর বোনাই কঠিনতম কাজ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বনসুন্দরিয়া, তসরালা, জলধাপার মত গ্রামে প্রায় ৭৫% মানুষ হোগলা চাষের সঙ্গে যুক্ত। লাভ নেই বেশি। সাধারণত দু'জন সারাদিনে ৬ ফুট x ৩ ফুট দৈর্ঘ্যের ১টি মাদুর বুনতে পারেন। বেশী খাটলে ছোট একটা মাদুর-ও উঠে যেতে পারে। একটা মাদুর কিনে বিক্রি করতে পারলে ৩০-৪০ টাকা লাভ থাকে (Ghosh and Santra, 1997; Ghosh, 2000; Ghosh & Ghosh 2002; Ghosh 2002)। এসব ক্ষেত্রে নিজের শ্রমটুকুই লাভের পুঁজিতে যোগ হয়। এখানে মেয়েরা হাঁটু মুড়ে বসে মাদুর বোনেন। ভারি পাটা চালিয়ে মাদুর বুনতে গিয়ে অনেকে কোমরের বাত, গ্যাস, অম্বল ও বুকের ব্যথায় ভোগেন। ভাল না লাগলে উপায় কী? গ্রামের সবিতাদিদের কথায় — 'মাদুর বুনে দু'পয়সা আসে বলে এ গ্রামের মেয়েদের কলকাতায় বাবুর বাড়ি কাজ করতে ছুটতে হয় না।' ওঁদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে কখন যে ওঁদের ভাল লেগে গিয়েছিল জানি না। ওঁদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে বিকল্প উপার্জনের ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ওঁদের অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ব্যবস্থা হয়েছে। শোলার কাজ শেখানো হয়েছে এই সব গ্রামের অনেক ছেলেমেয়েকে। তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। জলধাপার স্থানীয় স্কুলের হেড মাস্টারমশাই শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তীর আন্তরিক সহযোগিতায় এ গ্রামে জীববৈচিত্র প্রীক্ষণ শিবির হয়েছে। ঐ কর্মশালা পরিচালনা করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম তারই কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে হাতের কাজ শিখিয়ে হোগলার মাদুর বোনার বিকল্প ব্যবস্থা করার মাধ্যমে। আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। মায়েদের আত্মসম্মানবোধ ও হতদরিদ্রের মধ্যে দিয়ে সংসারকে ধরে রাখার এ শিক্ষা বোধ হয় ভারতের গৌরব। হাইটেক সোসাইটি থেকে এঁরা অনেক দূরে। শোলার কাজকর্ম শেখার মধ্যে দিয়ে এ গ্রামের বেশ কিছু মানুষ আজ বিকল্প রুজির সন্ধান পেয়েছেন।

শোলা চাষ : শোলা গাছ ধানজমি থেকে শুরু করে পুরানো খাল, বিল,

এর পর ২ পাতায়

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

'আবহাওয়া এখন খ্যাপা জন্তুর মতো। মানুষ তাকে ছুঁচলো লাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছে।' — মন্তব্যটি করেছেন বিজ্ঞানী ড. ওয়েলোভা ব্রোকার। আবহাওয়ায় আমরা ভীষণ খামখেয়ালিপনা লক্ষ্য করছি। বিজ্ঞানীর মন্তব্যটি যথার্থ। উদাহরণে আসি। চেরাপুঞ্জি-মৌসিনরাম অঞ্চলে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় (১২৫০-১৪০০ সেমি। ২০০৩ সালে এই অঞ্চলে বৃষ্টি প্রায় হয়নি বলা চলে। অন্যদিকে মুম্বাইয়ে অতি বৃষ্টিতে বন্যা নেমে আসে। ২০০৬ সালে আগস্ট মাসে লন্ডনের তাপমাত্রা উঠেছিল ৩৮° সেলসিয়াসে যা নাকি লন্ডনবাসীরা স্মরণকালের মধ্যেও অনুভব করেনি। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের সুনামির ক্ষত আজও বর্তমান।

সারা পৃথিবী জুড়ে আবহাওয়ার এমনি খামখেয়ালিপনা চলছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এসবই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফল। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর প্রসঙ্গে আসার আগে আসি গ্রিন হাউস এফেক্টে (Green House Effect)-এর কথায়।

শীতপ্রধান অঞ্চলে কাচের ঘরে চারাগাছ বাঁচিয়ে রাখা হয়। কারণ এই ঘরের ভেতরটা থাকে বেশ গরম। কাচের ভেতর দিয়ে সূর্যের রশ্মি সহজেই কাচের ঘরে ঢুকতে পারে। কাচের ঘর তখন গরম হয়। তারপর গরম মাটি থেকে উঠে

এর পর ৬ পাতায়

জলাভূমির জীবনদর্শন

১ পাতার পর

ডোবাসহ বড়বড় জলাভূমিতে জন্মায়। শোলা গাছেরও দুটি প্রজাতি আছে। একটি *Aeschynomene aspera* ফুলশোলা। আর একটি *Aeschynomene indic* কাঠশোলা। এর মধ্যে ফুলশোলার কাণ্ড থেকেই শোলার কাজ হয়। শোলা আসলে শোলার কাণ্ডের মধ্যেকার সাদা মজ্জা। হাতের কায়দায় ছুরি চালিয়ে গোল নরম শোলা থেকে কাগজের মত রোল বার করেন শোলা শিল্পীরা। মোটেই সহজ কাজ নয়। যথেষ্ট মুন্সিয়ানার প্রয়োজনও বটে। ঐ বিশেষ ধরনের ছুরিগুলিকে বলে 'কাত' বা 'কাতি'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মথুরাপুর থানার মহেশপুর গ্রামের শোলার কাজ প্রায় ৩০০ বছরের পুরানো; ঐ গ্রামে গেলেই দেখা যাবে ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বড়োরা অক্লেশে 'কাতি' চালিয়ে যাচ্ছে — হাতের চাপে তৈরি হচ্ছে নানান শৌখিন জিনিস। আগে শোলা থেকে তৈরী হত চাঁদমালা, মালা, কদম, বিভিন্ন রকমের পাখি ও ঠাকুরের ডাকের সাজ (বন্ধুপ্রতিম স্বপন বলেন— ডাকে হাল্কা শোলার সাজ আসত বলে 'ডাকের সাজ' নাম হয়েছে)। এখন রুচি পাল্টিয়েছে। শোলার ওপর নানান চারুকলার কাজ শুরু হয়েছে বছর চল্লিশ/পঞ্চাশ আগে থেকে। শোলার কাজকে পৃথিবীর মানচিত্রে নিয়ে এসেছেন বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের প্রবাদপ্রতিম অনন্ত মালাকার। প্রায় সত্তরোর্ধ সদাহাস্য মালাকার মশাই নিজেই যেন শোলাশিল্পের উৎকর্ষের আকর। তারাশঙ্করের উপন্যাস থেকে প্রেরণা পেয়ে ভিন্ন সাদের শোলার কাজের ধারার তিনিই পথ প্রদর্শক। আজ দেশে-বিদেশে অনন্ত মালাকারের কাজ স্বীকৃত। সারা পশ্চিমবাংলায় এখনও পর্যন্ত ১৫০ এর বেশি স্বীকৃত শোলা শিল্পী আছেন। এঁদের অনেকেই রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি পেয়েছেন। বর্ধমানের আদিত্য মালাকার, দিনাজপুরের মধুমঙ্গল (বহুবার বিদেশে গেছেন), বাঁকুড়ার মাস্টারমশাই রনজিত কর্মকার (ইনি আবার আকাশবাণীর গীতিকারও), কৃষ্ণনগরের গৌতম বাগ প্রমুখদের হাতের কাজ ও শিল্পী মানসিকতা নজর কাড়ার মত। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে, বিভিন্ন লোকাচার, পূজা অর্চনা, আনন্দানুষ্ঠানে শোলার কাজের ব্যবহার সব জেলাতেই আছে। তবে জেলা ভেদে শোলার কাজের বৈচিত্রের ফারাকও আছে। সে অনেক কথা। আছে শোলা শিল্পীদের কাজের মানের ভেদ। গ্রামবাংলার মালাকার বলে এঁদের খ্যাতি। খ্যাতির বিড়ম্বনা! প্রায় প্রতি জেলায় অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলার সুবাদে এটা স্পষ্ট যে এঁদের প্রচুর ক্ষোভ আছে। শোলা শিল্পের প্রধান সমস্যা বাজার। অসম্ভব সুন্দর সমস্ত কাজ যথার্থ বাজারের অভাবে বিকোয় না। সংসার জোড়াতালি দিয়ে চলে প্রায় অনেকেরই। কিন্তু মনের দিক থেকে এঁরা সকলেই অনেক খোলামেলা। সরলতা এঁদের ভূষণ। তারই সুযোগ নেয় বেশ কিছু শহুরে অসাধু-সংস্থা। এঁদের প্রলোভন দেখিয়ে অনেক বেশি টাকায় শোলার কাজ কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ী এঁদের কব্জা করেন। টাকার লোভে গাড়ি করে জিনিস নিয়ে যখন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরে এঁরা আসেন তখন কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। এরপর ঐ অসাধু ব্যবসায়ীরা (এঁরা আসলে জার্মপ্লাজম স্মাগলারও বটে) নানা অছিলায় শোলাশিল্পীদের কাজের খুঁত বার করেন ও না নেবার ভান করেন। উদ্দেশ্য চরণতলে আত্মবলি দাও। ঘটেও তাই। বলিদান পর্ব চলে দিন পনের কুড়ি ধরে। এরপর যা হবার তাই হয়। দুতিন মাসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে তৈরি কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস কয়েক হাজার টাকায় দিয়ে আত্মসমর্পণ করে প্রাণে বাঁচেন অনেক শিল্পী। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মহেশপুর গ্রামের অনেক শোলা শিল্পী এভাবে প্রতারিত হয়েছেন। ভালো দিক কিছু আছে। এই গ্রামের যেসব মেয়েরা শোলার কাজ জানেন বিয়ের বাজারে তাঁদের কদর আছে। মহেশপুরের মেয়েরা পশ্চিমবাংলার শোলার কাজের প্রসারে অনেকটাই ভূমিকা নিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে নতুন বউ কাজ শিখিয়েছেন দেওর-ননদদের। খোঁটা খেতে হয়নি। মান বেড়েছে। একশ টাকার শোলা দিয়ে তার আনুষঙ্গিক (আঠা, জরি, রাঙতা ইত্যাদি) বড়জোর পঞ্চাশ টাকা খরচ করে একমাসে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত উপার্জনের সুযোগ আছে। যা নেই তা হল বাজার। বিদেশে চাহিদা আছে। ঈদের সময় আরব দুনিয়ায় 'চাঁদ-তারার' বাজার খুব ভাল। শোলা শিল্পীরা এখন indoor-decoration এর কাজ করেন। দোকানপাট সাজিয়ে দেন। মডেল তৈরি করেন। এইসব মডেল যথেষ্ট হালকা হওয়ায় বিদেশে পাঠাতে সুবিধা হয়।

পানিফল চাষ : পশ্চিমবাংলায় প্রায় হাজারের বেশি পরিবার পানিফল চাষের সঙ্গে যুক্ত। পানিফল (*Trapa natans var. bispinosa*)সাধারণত রেললাইন বা বাসরাস্তার দু'পাশের সরকারী খাসজমিতে পানিফলের চাষ হয়। উত্তর চব্বিশ পরগণায় কোথাও কোথাও নীচু ধানজমিতে জল ধরে রেখেও পানিফলের চাষ হয়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ২০,০০০—৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত পানিফল বিক্রি হয়। খরচ ও পরিশ্রম আছে। আছে জীবনহানির আশঙ্কা। তবে চাষীরা অভিজ্ঞ। পানিফলের নানান রোগ হয়। পোকামাকড় নষ্ট করে ফেলে। বিষ (pesticide) ছড়ান চাষীরা। দুর্গাপুজোর সময় যে পানিফল ওঠে তার দামই বেশি।

মাদুর কাঠি চাষ : পশ্চিমবাংলায় মাদুর কাঠি চাষ প্রধানত মেদিনীপুরেই বেশি হয়। এছাড়া উত্তর চব্বিশ পরগণার মসলন্দপুর, মুর্শিদাবাদের চরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, হাওড়ার কোন কোন অঞ্চলে মাদুর কাঠির চাষ হয়। মাদুর কাঠি মুথা জাতীয় গাছ। এর তৃণকাণ্ড কাঁচা অবস্থায় চিরে শুকিয়ে নিয়ে কাঠি তৈরি করা হয়। ঐ কাঠি দিয়েই তৈরি হয় মাদুর। হোগলার মত মাদুর-কাঠি থেকে মাদুর বোনার পদ্ধতিও একইরকম। নিজেদের শ্রমের টাকা বাইরে দিতে হলে এরা লাভের মুখ দেখতেন কিনা সন্দেহ। মেদিনীপুর জেলার সবং, পটাশপুর, বলপাই, এগরা, রামনগরের মাদুরের খ্যাতি আছে। রামনগরের মসলন্দ মাদুরের খ্যাতি বিদেশেও আছে। অসাধারণ দক্ষতায় তৈরি এই মাদুর সতরঞ্চীর মত নরম। এর ওপর সিল্কস্ক্রিন প্রিন্টিং পর্যন্ত হয়। এক একটি তেমন তেমন কাজ হলে প্রায় তিন-চার হাজার টাকায় বিক্রি হয়। মাদুরের কাজেও রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি পেয়েছেন পশ্চিমবাংলার কয়েকজন শিল্পী। রামনগরের পুষ্পরানি জানার নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সদাহাস্যময় পুষ্পদির বাড়িতে গিয়ে দেখেছি সারাদিন পরিশ্রম করে চলেছেন। একভাবে বসে নিখুঁত দক্ষতায় মসলন্দ মাদুর তৈরি করেন। সদা স্মিতহাস্যময়ী। অভাবের সংসারের পুষ্পদির স্বলজ্জ হাসি যেন সব কিছুকে জয় করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প নিগমের আর্থিক আনুকূল্যে এ পর্যন্ত অন্তত পঞ্চাশ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন পুষ্পরাণি জানা। মাদুর চাষ করলে এক বিঘা জমি থেকে প্রায় ১১,০০০ টাকার মাদুর বিক্রি হতে পারে। তাই মোটের ওপর পাঁচশতক জমি থাকলে

এরপর ৩ পাতায়

জলাভূমির জীবনদর্শন

২ পাতার পর

মাদুর চাষ করে পাঁচজনের সংসারের মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়। জলাভূমি নির্ভর জীবিকায় পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলার থেকে মেদিনীপুর অনেকটাই নির্ভরশীল আর মাদুর কাঠির চাষ ও ঐ কাঠি থেকে মাদুর বোনার উপর অন্তত ১-৩% মানুষ সারা পশ্চিমবাংলায় নির্ভরশীল।

মাখানা চাষ : মাখানা বা কাঁটাপদ্ম (*Ewcyale ferox*) বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও পশ্চিমবাংলার কলকাতা সহ হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের খাল বিলে দেখা যেত। মূল ও কাণ্ড ছাড়া সারা দেহে কাঁটাযুক্ত এই গাছটির খাদ্যগুণ ও ভেষজমূল্য সারা পৃথিবীর যে কোন জলজ উদ্ভিদের থেকে বেশি। যদিও এই গাছের প্রথম ফসিল কোলকাতার আশপাশ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু আজ কলকাতার আশেপাশে তো নয়ই, এমনকি পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জায়গাও এর খোঁজ মেলা ভার। ১৯৯৯ সালের শেষ দিক থেকে মালদহ জেলার হরিশচন্দ্রপুর ব্লকে এর বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়। এরপর জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশেও মাখানা চাষ ছড়িয়ে পড়ে। লাভের অঙ্ক উল্লেখযোগ্য বলেই ঐ অঞ্চলে সম্ভাবনা থাকলে যেকোন জলাতে মাখানা চাষে ব্যবহার হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কেউ কেউ মাখানার পেটেন্ট পেতে উদ্যোগী হয়েছেন বা পেয়েও গেছেন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার মালদহ জেলায় অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ মাখানা চাষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। উত্তর বিহারে প্রায় ৮৬,০০০ হেক্টর জলাভূমিতে মাখানা নিয়মিতভাবে চাষ হয়। দ্বারভাঙ্গা, মধুবনীর মাখানার সারা পৃথিবীতে ভাল বাজার আছে। উত্তর বিহারে অন্তত ১,৫০,০০০ মানুষ মাখানা চাষের উপর নির্ভরশীল।

মাখানার বীজ থেকে তৈরি ভাজা মাখানা কলকাতার বাজারে ১৫০-১৮০ কিলো দরে পাওয়া যায়। দ্বারভাঙ্গাবাজারে এর দাম অনেক কম। মাখানা বীজের খাদ্যগুণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এর মধ্যে প্রায় ৭৭% স্টার্চ। এই স্টার্চ সহজপাচ্য হওয়ায় চীনদেশে মাখানার বীজ থেকে শিশুখাদ্য তৈরির ভাল বাজার আছে। মাখানার বীজের অ্যামাইনো অ্যাসিড ইণ্ডেকন ডিমের সঙ্গে তুলনীয়। ১০০ গ্রাম ভাজা মাখানা (Makhana puff) খাদ্যগুণে ১০০ গ্রাম মাছের কাছাকাছি। ধাতুজনিত নানান রোগের নিরাময়ে মাখানার কাঁচা বীজের বিশ্বব্যাপী ব্যবহার আছে। বিদেশে ঔষধ শিল্পের জন্য প্রতি কিলোগ্রাম মাখানা বীজ প্রায় ২০০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়।

জলাভূমির শাকসব্জি চাষ : পশ্চিমবাংলার সমতল থেকে শুরু করে পাহাড়ি উপত্যকা পর্যন্ত সর্বত্রই জলাভূমিতে নানা ধরনের 'শাক' জন্মায়। এর মধ্যে কোনো কোনটি আবার বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়। এই প্রসঙ্গে সমতলের কলমিশাক (*Ipomoca aqutica*) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাতে গোনা কয়েকটি জেলা ছাড়া সমতলে প্রায় সব জায়গাতেই কলমি জন্মায়। এখন অনেক জায়গায় বাণিজ্যিকভাবে চাষও হয়। চব্বিশ পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ), হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, নদীয়া, বাঁকুড়া জেলায় কল্‌মি চাষ হাজার হাজার মানুষের দু-মুঠো অন্নের সংস্থান করেছে।

হিংচে, ব্রাহ্মী, শুষনি, কুলেখাড়া শুধু শাক হিসাবে নয় ভেষজ গুণের জন্যও সারা পশ্চিমবাংলায় অল্পবিস্তর বিক্রি হয়। গ্রামের হত দরিদ্র মেয়েরা খাল-বিল-নালা, জলা-জমি থেকে শালুক-কল্‌মি-হিংচে এ ধরণের নানান শাক তুলে এনে হাটে বাজারে বিক্রি করে তেল-নুনের খরচ জোগাড় করেন। বর্ষার পরে খাল, বিল, পুকুর, ধানজমি থেকে শালুকফুল তুলে বাজারে বিক্রি করে অনেকেই জীবন চালান। কোথাও কোথাও শালুক চাষও হয়। শালুক তুলতে গিয়ে সাপের কামড়ে জীবন গেছে এমনও শোনা যায়। জীবন হাতে নিয়ে রুটি-রুজির সংস্থানে নামতে বাধ্য হয়েছেন এমন মেয়েদের সংখ্যা এ বাংলায় কম নয়।

কচু জলাভূমির গাছ। কচু চাষ যথেষ্ট লাভজনক। বীরভূমের কচু চাষ সারা পশ্চিমবাংলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বালু দোঁয়াশ মাটিতে গাঁঠিকচু চাষ ভাল হয়। আবার কাদামাটিতেও কচু চাষ হয়। কাদামাটিতে শোলাকচুর চাষ হয়। এখন প্রায় জেলাতেই মাটির প্রকৃতি বুঝে কচু চাষ হয়। বাজারে গাঁঠি কচু, শোলাকচু, কচুর ডাঁটি আর কচুর লতির যথেষ্ট চাহিদা আছে। পুকুর পাড়ে বা খালের ধার বরাবর অযত্নে বেড়ে ওঠা কচু গাছও অনেক মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। ট্রেন সিগন্যালে আটকে আছে বেশ কিছুক্ষণ। স্বভাববশত আমার চোখ পাশের জলাগুলোতে চলে যায়। হঠাৎ দেখি এক মহিলা একটা বঁটি আর থালা হাতে বেরিয়ে এলেন। মুহূর্তে বঁটি দিয়ে পুকুর পাড় থেকে কেটে ফেললেন বেশ কিছু কচু গাছ। অনেকটা 'গল্প হলেও সত্যি' সিনেমায় রবি ঘোষের স্টাইলে কচুর ডাঁটিগুলো কেটে ধুয়ে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে গেলেন। হয়ত কচু সেদ্ধ খেয়েই চলে যাবে সকালটা। এই হল জলাভূমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক — এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। জলা সর্বদাই জীবনমুখী।

জলাভূমির ভেষজ : বচ, থানকুনি, কুলেখাড়া, শুষনি, শালুক, মাখান— এ সব গাছের ভেষজ গুণের জন্য আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসাবিদ্যায় এসব গাছের ব্যবহার আছে। হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রেও জলাভূমির গাছপালার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। বচ্, কুলেখাড়া, শুষ্‌নি, স্পাইরানথিস ইত্যাদি আরও অনেক গাছপালার হোমিওপ্যাথ ঔষধ প্রস্তুতিতে ব্যবহার আছে।

জলাভূমির সম্পদ দিনের পর দিন মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে এটাই শেষ কথা নয়। জলাভূমির পরিবেশগত দিকগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই জলাভূমির সুষ্ঠ বিবেচনাপ্রসূত ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে জলাভূমির সংরক্ষণ আশু কর্তব্য। বড় বড় জলাভূমির সংরক্ষণ করার জন্য গুরুত্ব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আইন আছে। সমস্যা ছোট ও মাঝারি জলাভূমি। এদের জন্য পশ্চিমবাংলার মৎস দপ্তরের সুনির্দিষ্ট আইন আছে। পাঁচকাঠা পর্যন্ত জলাভূমি 'Pisciculture' -এ ব্যবহৃত হলে তা ভরাট করলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান খাতায়-কলমে আছে। জলাভূমি ভরাট হয়ে যাওয়া শুধু উন্নতশীল দেশের সমস্যা নয়। সবদেশেই এ সমস্যা আছে। ইউনাইটেড স্টেট্‌স-এর মত দেশেই প্রায় ৫৪% জলাভূমি ধ্বংস হয়েছে। ইউরোপিয়ানদের বসতি স্থাপনের জন্য। অন্তত ৪০% জলাভূমি ভরাট হয়েছে ভারতে। কোলকাতার আশপাশে জলাভূমি ভরাট নিয়ে যথেষ্ট সমস্যা আছে।

মরণোত্তর চক্ষুদান সপ্তাহ পালন করুন

(২৫শে আগস্ট — ৮ই সেপ্টেম্বর)

মরণোত্তর চক্ষুদান হোক আপনার পারিবারিক ঐতিহ্য

ডাইনি প্রথা

১ পাতার পর

বিনিময়ে তাদের দুর্দশার মিথ্যা কারণ বলে থাকেন। আর তাদের দুর্দশার কারণ হিসাবে ডাইনি (কোনও প্রেতাত্মা) বলে চিহ্নিত হন গ্রামের কোনও নিরপরাধী মানুষ। মহামারী রুখতে তাদের পরামর্শ হল ডাইনি হত্যা। এই কারণে ভীত, সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষেরা ডাইনি বলে চিহ্নিত ব্যক্তিকে মারধর করে বা একঘরে করে অথবা কখনও কখনও হত্যা করে নিছক নিশ্চিন্তে থাকতে চায়। কখনোবা চিহ্নিত ব্যক্তির স্বামী-পুত্র-কন্যাও নির্দ্বিধায় তার ওপর অত্যাচার চালায়।

ডাইনি প্রথা প্রথম কবে এবং কোথায় চালু হয়েছে তা আজও অজানা। সতীদাহ প্রথার সাথে ডাইনি প্রথার তুলনা করা যায়। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও বহু পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই ডাইনি হত্যার খবর পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে এক ১৯ বছর বয়সের তরুণী জোয়ান অফ আর্ককে ডাইনি সন্দেহে হত্যা করা হয় অন্যায়ভাবে, ১৯৭৮ সালের মালদহের মোড় গ্রামের নাও পাড়াতে দুজন মহিলাকে ডাইনি সন্দেহে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে মারা হয়। জোয়ান অফ আর্কের কথা আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষ জানেন। কিন্তু জোয়ান অফ আর্কের মতো যারা বলি হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাদের খবর সবাই রাখে না। এরকমই কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক ২০০৪ সালের কিছু ঘটনায় (বিজ্ঞান অন্বেষক, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৬)। ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে বর্ধমান জেলার ভাতার থানা এলাকার জামবনি গ্রামের লক্ষীটুডু (৪৫)কে ডাইনি অপবাদে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ৩০শে আগস্ট ২০০৪ শিলিগুড়ির খাড়বাড়িতে জবা হেমব্রম (৮৫) নামে এক বৃদ্ধাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়। ২৬শে মার্চ ডুয়ার্সের চা বাগানে ডাইনি সন্দেহে দুইজন মহিলাকে হত্যা করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোনো থানার মাংরুল গ্রামের এক আদিবাসী ঝাপু টুডু (৬) খুন হন (২৮শে মার্চ, ২০০৪)। ঐ বছরেই ২০শে জুলাই মুর্শিদাবাদের ডোমকলের ইসলামপুর থানার রায়পুর গ্রামের কল্পনা মালকে (৪০) বীভৎসভাবে মারধর করা হয়। এরকম ঘটনা আরও শোনা যায় যারা মৃত্যুর হাত থেকে কোনোরকমে বেঁচে গেছেন, কিন্তু অত্যাচারিত হয়েছেন নৃশংসভাবে। তাদের মধ্যে মালদহের রাজনন্দিনী উল্লেখ্য।

ডাইনি প্রথার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি পুরুষরাও। ডাইনি হিসাবে অত্যাচার চলে যুবক ও বৃদ্ধদের ওপর।

ডাইনি প্রথা'র কবল থেকে 'ডাইনি' চিহ্নিত অসহায়, দলিত পিড়ীতদের বাঁচাতে কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার —

ক) ডাইনি হত্যা বন্ধ করতে সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা হল সরকারী আইনের সাহায্য নেওয়া।

খ) অনগ্রসর সমাজের (যেমন আদিবাসী সমাজের) সার্বিক উন্নতি (যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি) ঘটানো প্রয়োজন।

গ) সমাজের সর্বস্তরের লোকদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটানো একান্ত প্রয়োজন।

ঘ) এলাকার কুসংস্কার বিরোধী সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা এবং জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার।

ঙ) বিশেষ প্রয়োজনে ডাইনি হত্যারোধে বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (যেমন- বিভিন্ন বিজ্ঞান দরবার, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সমিতি, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি প্রভৃতি)-এর স্মরণাপন্ন হতে হবে।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা তাদের সন্তানদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে, খেলাধূলায় আগ্রহ বাড়াচ্ছে। তাছাড়া সরকারীভাবে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ায় তারা বাইরের জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা চালাচ্ছে। আশা করা যায় ডাইনি প্রথার মতো কুপ্রথাগুলি শীঘ্রই সমাজ থেকে নির্মূল করা যাবে।

— সোমা দত্ত।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেও কুসংস্কার সচল

শুরু থেকেই শুরু করছি। খ্রীস্টপূর্ব ৫৮৫, আজ থেকে বহু বছর আগে 'বিজ্ঞানের জন্মদিনের' কথা দিয়ে শুরু করছি। ওই বছরের আঠাশে মে তারিখে তুর্কি দেশের মিলেটাস শহরে দারুণ সোরগোল পড়ে গেল। ছেলেবুড়ো সবাই রাস্তায়, ফাঁকা মাঠে ভিড় করতে লাগল, সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে, কারণটা কি? আসলে, 'হ্যালিম' নামে একজন পণ্ডিত আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছেন, আজ এই শহর থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। সেদিন সত্যিই ঐ শহর থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা গেল। এই দিনটিই 'বিজ্ঞানের প্রকৃত জন্মদিন। ঐ দিন প্রথম সূর্যগ্রহণ হল তা কিন্তু নয়। সূর্যগ্রহণ আগেও হত। তবে এই প্রথম আগাম সূর্যগ্রহণের খবর সকলের জানা ছিল। এবং সকলেই সানন্দে তা চাক্ষুস করেছে। ইতিপূর্বে যখন সূর্যগ্রহণ হত, পুরোহিতেরা ব্যাখ্যা করতেন 'গ্রহণ আসলে দেবতা বা অপদেবতার কাণ্ড'। সে জন্য শাঁখ-ঘণ্টা-কাঁসর বাজিয়ে, পূজো করে, মন্ত্র পড়ে দেবতাকে খুশী করা হত। আসলে, থ্যালিস সূর্যগ্রহণকে ব্যাখ্যা করেছেন একটি প্রাকৃতিক (লৌকিক) ঘটনা হিসাবে, অলৌকিকতা, কুসংসকারের কোন ছাপ এর মধ্যে ফেলেনি। থ্যালিস বহু শতাব্দী আগে সূর্যগ্রহণের কারণ সহ ব্যাখ্যা খুঁজে লৌকিক ঘটনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও এখনও সূর্যগ্রহণ নিয়ে বহু অলৌকিক ব্যাখ্যা প্রচলিত।

সূর্যগ্রহণ নিয়ে উদাহরণ দেওয়া হল, এমন বহু প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনে বিজ্ঞানসম্মত কারণ থাকলেও কুসংসস্কারের মোড়কে জনমানসে প্রচলিত। অজ্ঞানতা যেমন কুসংস্কারের একটি কারণ, তেমন শাসকদলের (রাজা, পুরোহিত, সম্রাট প্রভৃতি) প্রতাপ টিকেয়ে রাখাও কুসংস্কার টিকে থাকার আর একটি কারণ। যেমন ধরা যাক, মিশরের পিরামিড, পিরামিডের কোনো কোন একখানা পাথরের ওজন নাকি ৩৫০০-৩৬০০ কুইন্টাল। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডেটাস বলেছেন পিরামিড

এর পর ৫ পাতায়

New Dynamic Engineer's Co-Society Ltd.
Govt. Contractors
354, Siraj Mondal Rd., Kanchrapara.
Ph: 2585-9243

✆ 25890019(R)
Subrata Das
Club Member Agent
LICI (Kalyani Branch)
Residence:
Purbasha, Gokulpur
P.O. Kantaganj- 741250

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

১ পাতার পর

আসা কমজোরি বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণকে কাচ আটকে দেয়। দেখা যাচ্ছে, কাচের ঘরে যতটা তাপ প্রবেশ করে তার চেয়ে কম তাপ বাইরে আসতে পারে। এতেই কাচের ঘরের ভেতরটা ক্রমশ গরম হয়ে ওঠে। এই কাচের ঘর হল গ্রিন হাউস। পৃথিবীটাও যেন একটি গ্রিন হাউস। আর গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি হল তার কাচের দেওয়াল। মনুষ্যক্রিয়ায় সৃষ্ট কার্বন ডাই -অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, হাইড্রোফ্লুরো কার্বন, পারফ্লুরো কার্বন, সালফার হেক্সাফ্লুরাইড গ্যাসগুলি হলো মুখ্য গ্রিন হাউস গ্যাস। সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে পরিমাণ আলোক ও তাপশক্তি আসে তার প্রায় ৫১ % মাটিতে শোষিত হয় এবং বাকি অংশ বিকিরিত হয়। বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মাটি থেকে বিকিরিত তাপের অনেকটাই আটকা পড়ছে। ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমশ বাড়ছে। একেই বলছে গ্রিন হাউস এফেক্ট। সারা পৃথিবী জুড়ে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে বলা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে 'মেইন্ কাল্‌প্রিট' কার্বন ডাই -অক্সাইড গ্যাস। তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড দায়ী শতকরা ৪৯ ভাগ। মিথেন দায়ী ১৮ ভাগ, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস দায়ী ১৩ ভাগ। কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের দহন এবং নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে। আমেরিকা প্রতিবছর বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত করছে ২০ টন, রাশিয়া ১১.২ টন, ইংল্যান্ড ৯.৫ টন, জাপান ৯.৪ টন, অস্ট্রেলিয়া ৫ টন, চিন ২.৭ টন, ব্রাজিল ২ টন, ভারত ১ টন, সেলেগাল ০.৫ টন।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলির বক্তব্য ছিল, শিল্পের প্রসার সবচেয়ে বেশী উন্নত দেশগুলোতে, সুতরাং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান দায়ভার ঐসব দেশগুলোকেই নিতে হবে। এ দাবী অমূলক নয়। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ভারত দায়ী যেখানে মাত্র ৪ %, চিন দায়ী ৭ %, জাপান দায়ী ৬ % , ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি দায়ী ১৪% সেখানে আমেরিকা একাই দায়ী ২৫ %।

১৭৫০-এর দশকে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ০.০২৮ %। বিংশ শতাব্দীর শেষে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ০.০৩৭ %। ২০০৫ সালে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ০.০৩৭৯ %। কার্বন ডাই-অক্সাইড সহ অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। ১৯৯০-এর দশক উষ্ণতর ছিল ১৯৮০-এর দশকের চেয়ে এবং ১৯৮০-এর দশক ১৯৭০-এর দশকের চেয়ে বেশি। সেটা আবার তার আগেরটার চেয়ে বেশি। ১৯৯৫ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ১২টি বছরের মধ্যে ১১টির তাপমাত্রা ছিল আর সমস্ত বছরের চেয়ে বেশি। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলের বরফ, হিমবাহ গলছে। সামগ্রিক জৈব বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব আজ গভীর সংকটে। ২০০৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) -এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'The warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice, and rising global mean sea level.'

সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের এক আন্তর্জাতিক সংগঠন 'সিগমা জাই' তাদের এক রিপোর্টে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। রিপোর্ট বলছে দক্ষিণ এশিয়ায় সমুদ্রে জলতল বৃদ্ধি পাবে, সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা প্লাবিত হবে, মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়বে, মৌসুমী জলবায়ুতে দেখা দেবে মারাত্মক খামখেয়ালিপনা, জলসম্পদের অভাব ঘটবে। ইউরোপে শীতের তীব্রতা বাড়বে, গ্রীষ্মকালে নদীগুলোতে জলপ্রবাহ বাড়বে, পাহাড়ের হিমবাহ গলবে। উত্তর আমেরিকায় বসন্তের স্থায়িত্ব হ্রাস পাবে, নদীর গতিপথ বদলে যাবে, আটলান্টিক মহাসাগরে বেশী বেশী মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হবে, তাপ প্রবাহ বাড়বে। আফ্রিকায় খরা বাড়বে, জল সংকট দেখা যাবে, কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাবে।

'The bell has begun to toll'. পৃথিবী আজ গভীর সংকটে। সংকটে সমগ্র জৈব বৈচিত্র্য। বিপন্ন মানুষ প্রজাতি। গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎপাদন কমানোর ব্যাপারে ধনী দেশগুলির উদাসীনতা যেমন বর্জন করতে হবে। তেমনি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এ ব্যাপারে আরো সচেতন হতে হবে। দুটো একটা দেশের পক্ষে বা দুটো একটা দেশ বাদ দিয়ে একাজ সম্ভব নয়।

—গোবিন্দ দাস (০৩৩) ২৫৮৯-১৫১২

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেও

৪ পাতার পর

তৈরির জন্য যা পাথর লেগেছে, পাহাড় থেকে সেই পাথর কাটার জন্য এক লক্ষ মানুষকে দশ বছর একটানা পরিশ্রম করতে হয়েছে। তারপর কত পথ পার করে এনে পিরামিড গাঁথা, তার ভেতরে সুখে জীবনযাপন করার জন্য সবরকম প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এতবড় পিরামিড, তার ভেতরে এত বিলাসসামগ্রী এই সবকিছুই মারা যাওয়া রাজার আমোদের জন্য — যা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তবুও কুসংস্কারের কারণে এতবড় কাজ করা যেত। লক্ষাধিক লোক নিযুক্ত থাকত এরকম একটা ভিত্তিহীন কর্মকাণ্ডে সবটাই অজ্ঞানতার দাপটে চলত। তৎকালীন সময়ে অনেক পুরোহিত খুব প্রতিভার অধিকারী ছিল, তাঁরা বেশ কিছু আবিষ্কারেও তাদের ছাপ ছিল— কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ছিল না। শাসকদলের ঠিকভাবে শাসনকার্য চালানোর জন্য কুসংস্কার টিকিয়ে রাখা তাদের অতি প্রয়োজনীয় সেজন্য তারা বিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। এখনও একদল শাসক শাসন করে তার রাষ্ট্রকে, এবং প্রধানত সেই কারণেই আমাদের সমাজে এখনও টিকে আছে কুসংস্কার। এটি প্রধান বা অন্যতম কারণ হলেও অজ্ঞানতা বা বিজ্ঞানমনস্কতার অভাবও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এখন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরীক্ষাগার রয়েছে, আবিষ্কৃত হয়েছে বিজ্ঞানের অনেকগুলি শাখা। প্রতিনিয়ত চলছে গবেষণা, হচ্ছে আবিষ্কার। সভ্যতা হচ্ছে উন্নত থেকে উন্নততর। গোটা পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়, মুহূর্তেই বিশ্বের যে কোনও জায়গার সাথে যোগাযোগ সবই সম্ভব এখন বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের জন্য। তবু বর্তমান সভ্যতা কুসংস্কার মুক্ত নয়।

প্রচলিত কিছু কুসংস্কার : প্রযুক্তিবিজ্ঞানের দান দ্রুতগামী ট্রাক বা যেকোন মোটরগাড়ি এইসব গাড়ি চলার সময় সামনে বিড়াল চলে গেলে চালক গাড়ি থামিয়ে দেয়। কারণ, দুর্ঘটনা এড়ানো। কিন্তু বিজ্ঞানের যাওয়ার সাথে দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই। বরং কুসংস্কারের বশে হঠাৎ দেখা বিড়ালের জন্য ব্রেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

পিছনে ডাকলে, যে কাজে বের হচ্ছে তা ব্যর্থ হয়। এর পর ৭ পাতায়

প্ল্যানেট আর্থ — ভারতে যার প্রয়োজন সব থেকে বেশী

শুধু আর্থ শব্দোচারণে মনে হবে নিছকই পৃথিবী। কিন্তু আর্থ-এর আগে প্ল্যানেট শব্দটি বসিয়ে দিলে তার ব্যঞ্জনা বহুগুণে বেড়ে যাবে। তখনই মনে হবে এই পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের কথা, মনে হবে জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশের কথা, জল, জমি অরণ্যের কথা। প্ল্যানেট আর্থ বললেই কেমন একটা সবুজ গাছপালার কথা মনে ভেসে আসে।

খুব সম্প্রতি বিবিসি-ডিসকভারি চ্যানেল প্ল্যানেট আর্থ শিরোনামে এক অভূতপূর্ব চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে। আর এই চলচ্চিত্র নির্মাণে পৃথিবীখ্যাত ক্যামেরাম্যানরা গোটা বিশ্বের মরুভূমি, নদী, মেরুপ্রদেশ এবং গুহাতে তন্নতন্ন করে ঘুরে বেরিয়েছেন এবং পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্যকে ক্যামেরাবন্দি করে এই প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছেন। Sanctuary'র সম্পাদক বিট্টুসাগলের ভাষায় এই চলচ্চিত্র এমন সব জীবন্ত প্রাণী দেহকে তুলে ধরেছে, যাদের অস্তিত্ব আগে কল্পনাই করা যেত না। প্ল্যানেট আর্থ এর পরিচালক ডেভিড এ্যাটেনবরোকে অসীম শ্রদ্ধা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করে বিট্টু সায়গল প্রতিটি পরিবেশপ্রেমীকে এই বিশ্বকে বাঁচাবার জন্য সামান্য দায়িত্ব নিতে বলেছেন।

বিট্টু সায়গলের মতো এত বড় একজন সাংবাদিককেও বলতে হয়েছে পরিবেশগত বার্তা পৌঁছনোর ব্যাপারে এত কার্যকরী মাধ্যম তিনি এর আগে প্রত্যক্ষ করেননি। প্যানেট আর্থ আমাদের বাঁচবার, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কথা বলেছে।

সায়গল লিখেছেন এতদিন পর্যন্ত বিশ্ব উষ্ণতার মতো ভয়াবহ ঘটনাকে লাগাতার অস্বীকারের পর এবং চরমভাবে উদাসীনতা দেখানোর পর এবং কিয়োটো প্রোটোকলে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকারের পর মাননীয় বুশ মহাশয় এবং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মহোদয় উভয়েই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বিশ্ব উষ্ণতা একটা সমস্যা এবং গোটা বিশ্বের জল-হাওয়াতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে কিন্তু প্যানেট আর্থ চলচ্চিত্রায়ণের পরও এই প্ল্যানেটের বাস্তুতন্ত্রকে বলগাহীনভাবে ধ্বংস করার মারণ খেলা থামানোর কোনও লক্ষ্যই নেই। অর্থাৎ কার্বন এনার্জি যা থেকে গোটা দুনিয়া চলছে এবং যেটা বিশ্ব উষ্ণতার বৃদ্ধিকে তীব্রভাবে বাড়াচ্ছে তার বিকল্প কোনও পরিবেশ নীতি ধনী দুনিয়ার শাসকরা দিতে পারেননি।

এই বিশ্ব উষ্ণতা যে অর্থনৈতিক বনিয়াদকে ধ্বংস করবে, তাই নয়, মানুষের জীবনেরও ইতি ঘটাবে। গোটা পৃথিবী জুড়ে এই পরিবেশগত বার্তা পৌঁছে দেবার প্রশ্নে দুটো বড় কাজ তথাকথিত বিশ্ব নেতৃবর্গের পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে। আল গোরের অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত তথ্যচিত্র An Inconvenient Truth সমস্যার মূলে আঘাত করেছে। এই চলচ্চিত্রের একস্থানে আলগোরে বলেছেন, 'It is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it'.

বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'সেই মানুষকে এটা বোঝানো অত্যন্ত কঠিন যার মাস বেতন নির্ভর করে কোনও কিছু না বোঝার উপর। অর্থাৎ কেন যে মাস শেষে বেতন পাচ্ছে, এটাই যখন সে বোঝে না তখন কোনও কিছুই তাকে বোঝানো যাবে না। সুতীব্র কষাঘাত সন্দেহ নেই। তবুও বিশ্ব উষ্ণতা নিয়ে সকলেই নীরব।' দু-একজন ছাড়া।

বিশ্ব উষ্ণতা বিষয়ে খুব সরাসরি কথা বলেছে রাষ্ট্রসংঘের Intergovernmental Panel on climate change (IPCC) — : বিশ্ব উষ্ণতা এখন দ্ব্যর্থহীন জায়গায় পৌঁছেছে। এটা বোঝা যায় পৃথিবীর বাতাস এবং সমুদ্রের তাপমাত্রা বেড়ে যাবার ঘটনায় এবং তীব্রভাবে হিমবাহ গলে যাবার ঘটনায়।

বিশ্ব উষ্ণতাকে না আটকানোর জন্য যে কারণগুলো সাধারণভাবে দেখানো হয় সেটা হল, প্রশাসকদের একই ধরনের কথা, 'আমরা এর ফলাফল জানতাম না' গোছের উত্তর। অথবা সেই বহু ব্যবহৃত উত্তর আমি কেবলমাত্র ওপরওয়ালার নির্দেশ পালন করছি।

প্রশাসনের উচ্চতম মহলে যারা দায়দায়িত্ব এড়িয়ে চলেন তাদের চোখ খুলে দেবে Planet Earth আমি জানতাম না গোছের উত্তর যারা করেন তাদেরকে প্ল্যানেট আর্থ বলছে : এই সুন্দর গ্রহ ধ্বংসের মুখে এবং একে বাঁচানোর জন্য সবাই মিলে চেষ্টা না করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মনে করবে যে আমরা এই ধ্বংসলীলার সাক্ষী হয়েছিলাম। নীরব থেকে পৃথিবীকে ধ্বংস করবার কাজে সহায়তা আর নাৎসী ক্যাম্পে ইহুদী নিধনের সমর্থক হওয়া একই কাজ —মত সায়গলেরও।

প্ল্যানেট আর্থ অত্যন্ত শক্তিশালী, নান্দনিকতায় সেরা এবং অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক চলচ্চিত্র। বিট্টু সায়গল এই চলচ্চিত্রকে দেশের প্রান্তে প্রান্তে নিয়ে যাবার কথা বলেছেন বিশ্ব উষ্ণতার হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য। পৃথিবীর দুশো প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পৃথিবীর বৈচিত্র্যকে প্রায় চল্লিশ জন ক্যামেরাম্যান বন্দি করেন। যে এগারোটি খন্ডে প্ল্যানেট আর্থ নির্মিত হয়েছে তার দিকে তাকানো যাক।

এপিসোড ১ : উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু — এখানে পৃথিবীর যে প্রাকৃতিক ইতিহাস আছে অর্থাৎ ঋতু পরিবর্তন এবং ঋতু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাণীকুলের বিশেষ করে পরিযায়ী পাখীদের দেশান্তরী হওয়ার ঘটনা। আছে কালাহারি মরুভূমি থেকে ওকাভাঙ্গো জলভূমিতে হাতিদের চলে যাবার ঘটনা।

এপিসোড ২ : পার্বত্য অঞ্চল : বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পর্বতমালার ভৌগলিক এবং আগ্নেয়গিরির ইতিহাস। এই আগ্নেয়গিরি কিভাবে ভূপ্রাকৃতিক সৃষ্টি করেছে সেটা দেখতে দেখতেই বোঝা যাবে তুষার চিতাদের শিকারের ঘটনা এবং বিশালাকৃতির রেড পান্ডাদের সাতদিনের শিশুকে যত্নের দৃশ্যের ঘটনা। এটা ছাড়াও আছে সেই ডিময়েসেল সারস যারা অক্লেশে হিমালয় পর্বত ডিঙ্গিয়ে যায়, সেই দৃশ্য।

এপিসোড ৩ : মিষ্টি জল; পাহাড়ের নদী উৎস থেকে সমুদ্র পর্যন্ত নদীপথের বর্ণনার দৃশ্য। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে নদীতে যে বিপুল সংখ্যায় জলজ প্রাণী ঘুরে বেড়ায় তাদের বর্ণনা। দঃ ভেনেজুয়েলার এঞ্জেল জলপ্রপাত থেকে ব্রাজিলের পান্টানাল জলাধারের অভূতপূর্ব দৃশ্য।

এপিসোড ৪ : গুহা; মেক্সিকোর সোয়ালো গুহা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

এর পর ৭ পাতায়

প্ল্যানেট আর্থ

৬ পাতার পর

লেখুগিলা গুহার দৃশ্যাবলী শিহরণ সৃষ্টি করে। সোয়ালো গুহা ৪০০ মি: লম্বা সুড়ঙ্গ বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য স্থান।

এপিসোড ৫ : মরুভূমি; মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমির ব্যাকট্রিয়ান উট এবং চিলির আটকামা গুয়ালোকোস (এটাও উট) কিভাবে সেই প্রতিকূল মরুভূমিকে মোকাবিলা করে তার কাহিনী সম্বলিত দৃশ্য। মরুভূমিই উটকে বাঁচিয়ে রাখে না উটই মরুভূমিতে বেঁচে থাকে, সেই চিন্তাই জাগাবে এই এপিসোড।

এপিসোড ৬ : বরফের চাদর বা আইসওয়ার্ল্ড, মেরুপ্রদেশ বা আন্টার্কটিক অঞ্চলের বরফাবৃত দৃশ্য যেটা এখন ভয়াবহ বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু হিমবাহ গলে যাবার দৃশ্যই নয়, এম্পারার পেঙ্গুইন এবং মেরুদেশীয় ভালুক কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছে তারও দৃশ্য দেখা যাবে।

এপিসোড ৭ : সমতলভূমি; এই খন্ডচিত্রটির মর্মমূলে আছে শুধুই তৃণভূমির বৈচিত্র্য। জৈব বৈচিত্র্যের মূলে আছে এই তৃণভূমি। আর এই তৃণভূমিই প্রাণীকুলের জীবনধারণ করছে।

এপিসোড ৮ : ঋতুর বৈচিত্র্য ও বনভূমি; ঋতু পরিবর্তন কিভাবে বনের বৈচিত্র্য নিয়ে আসে, সেটাই এখানে উপজীব্য।

এপিসোড ৯ : অরণ্য; গোটা পৃথিবীর বনবৈচিত্রকে এখানে ক্যামেরা নৈপুণ্যে ধরা হয়েছে। বনের বৈচিত্র্যই সবচেয়ে নিখুঁতভাবে এখানে ধরা হয়েছে।

এপিসোড ১০ : অগভীর সমুদ্র; মা হাঙ্গর কিভাবে তার বাচ্চাকে আগলে রাখে এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী উপকূলে ঘোরাঘুরি করে সেই দৃশ্য থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়ার প্রবাল দ্বীপ এবং sea lion, gigantic bull, king penguins starfish সবকিছুর দেখা মিলবে।

এপসোড ১১ : মহাসাগর; পৃথিবীর সমস্ত মহাসাগরের অভ্যন্তরের ভয়াল তিমি, হাঙ্গরের দৃশ্য আমাদের বাস্তবিক অন্য জগতে নিয়ে যাবে।

বৈচিত্র্যপূর্ণ এই পৃথিবীর এক জীবন্ত দলিল এই চলচ্চিত্র প্ল্যানেট আর্থ। মানুষ, বিশেষ করে মধ্যবিত্তরা যেখানে প্রাত্যহিকতায় জেরবার হচ্ছে, সংসারের চাহিদা, সংসারের পাঁচটি জিনিসের যোগান দিতে দিতেই তার বয়ঃবৃদ্ধি ঘটছে এবং গতানুগতিকতায় সে ঘুরপাক দেখাচ্ছে, তার বাইরে এক বিশাল পৃথিবীকে তুলে ধরেছেন এ্যাটেনবরো তার আর্থ প্ল্যানেটে। আর্থ প্ল্যানেট তো এক সুদীর্ঘ গবেষণাধর্মী চলচ্চিত্র যেখানে হিমবাহ থেকে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে যা আমাদের নিয়ে যায়। আমাদের উদাসীনতা, সংসার জীবনের মোহ, প্রকৃতির প্রতি নিদারুণ উন্নাসিকতা, সাংসারিক জীবনের লোভ লালসার মনঃসংযোগে অধরা থাকে এই পৃথিবীর রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ।

পাশেই তো বক্সার টাইগার রিজার্ভ; সংক্ষেপে বি টি আর। কিন্তু এখানে কোনও বাঘের চিহ্নই চোখে পড়বে না। বন দখল করে কমলালেবু বাগান গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে বনবস্তি। অথচ প্রতি বছর এই বাঘ সংরক্ষণের জন্যই সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। গাছ পাচার চলছে অবাধে। বন্য জন্তু, বনৌষধি সবই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কাজিরাঙ্গা থেকে সরিস্কা সর্বত্রই এক চিত্র। প্ল্যানেট আর্থের প্রয়োজন ভারতে সবচেয়ে বেশি।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেও

৪ পাতার পর

উদাহরণস্বরূপ সুমিতবাবু কাঁচরাপাড়া থেকে নৈহাটি যাবেন একটি ব্যাঙ্কের নৈহাটি শাখায় টাকা তোলার জন্য। বের হওয়ার সময় সুমিতবাবুর ছেলে পিছনে ডাক দিল। তবুও সুমিতবাবু বের হলেন। কাঁচরাপাড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখলেন বিশেষ কারণে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত রেল অবরোধ চলছে। অগত্যা বাড়ি ফেরা এবং ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে না পারার কারণ হিসেবে ছেলেকে দায়ী করা। কিন্তু এখানে উদাহরণ থেকে পরিস্কার যে ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে না পারার জন্য দায়ী ট্রেন অবরোধ।

টিকটিকির টিকটিক শব্দে যাচাই করা হয়। কোন কথা বলার পরেই যদি টিকটিকি টিকটিক করে ওঠে তবে সেই কথাটা অবশ্যই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু কথার সত্যতার সাথে টিকটিকির টিকটিক করার কোনও সম্পর্ক নেই। প্রথমত, এই শব্দ টিকটিকির একটি জৈবিক ক্রিয়া, দ্বিতীয়ত, টিকটিকির মানুষের কথা বোঝার মত ক্ষমতা নেই।

সকাল-সন্ধ্যে পূজা করে শাঁখ বাজালে, শাঁখের আওয়াজে জীবাণু ধ্বংস হয়। শাঁখের আওয়াজে কখনই জীবাণু ধ্বংস হতে পারে না। শাঁখের আওয়াজে শব্দের কম্পাঙ্ক 20 HZ-20000 Hz. এবং যে শব্দে জীবাণু ধ্বংস হতে পারে তা হল আলট্রাসনিক সাউন্ড যার কম্পাঙ্ক 20000 Hz থেকে 10^6Hz. সুতরাং শাঁখের শব্দ কখনই আলট্রাসনিক সাউন্ড নয়, তাই জীবাণু ধ্বংসের কোনও সম্ভাবনা নেই।

এরকম অসংখ্য কুসংস্কার এখনও সমাজে টিকে আছে। অথচ বিজ্ঞান আজ উন্নতির শিখরে বিরাজ করছে। বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞান জনপ্রিয়তা, সকলের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলার সুব্যবস্থা অবিলম্বে (যত তাড়াতাড়ি সম্ভব) করা প্রয়োজন। — *সমাপন*

দেশে দেশে হারিয়ে যাওয়াজলাভূমির পরিমাণ

- ইউনাইটেড স্টেটস-এ ৮,৭০০ বর্গমিটার অর্থাৎ ৫৪% জলাভূমি ধ্বংস হয়েছে।
- ইউরোপে এ পর্যন্ত হারিয়েছে ৪০% জলাভূমি।
- দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে হারিয়েছে ৮০% জলাভূমি।
- পর্তুগালে প্রায় ৭০% ও ফিলিপিন্সে ৬৭% জলাভূমি নষ্ট হয়েছে।
- ইউরোপিয়ানদের বসতি স্থাপনের জন্য ৯০% জলাভূমি ভরাট হয়েছে।
- ভারত, বাংলাদেশে ও পাকিস্তানের উর্বর জলাভূমির পরিমাণ কমেছে জলে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য।
- ভারতের পূর্ব কলকাতার জলাভূমির আয়তন ২০,০০০ হেক্টর থেকে কমতে কমতে আজ প্রায় ১২,৫০০ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে।

মনে রাখা দরকার যেকোন দেশে জলাভূমি ধ্বংস হলে তার প্রভাব অন্য দেশেও পড়ে।

যেকোনও কোণকে সমভাবে যেকোনও সংখ্যায় বিভক্ত করার পদ্ধতি

আমরা গণিত শাস্ত্রের জ্যামিতি বিভাগে একটি কোণকে সমদ্বিখন্ডিত, সমচতুর্খণ্ডিত, সমঅষ্টখণ্ডিত অর্থাৎ 2 x 2 x 2 ... সমখণ্ডিত করিতে পারি। কিন্তু সমত্রিখণ্ডিত, সমপঞ্চখণ্ডিত ইত্যাদি বিজোড় সংখ্যায় সমভাবে খণ্ডিত করতে পারি না। আমার পদ্ধতিতে যেকোন কোণকে সংখ্যক সমখন্ডিত করতে পারা যায়। যেখানে n যেকোন একটি অখণ্ড সংখ্যা (n = 2, 3, 4, 5, ... n)

আমি এখানে শুধুমাত্র একটি কোণকে সমত্রিখন্ডিত করার পদ্ধতি আলোচনা করব। বেশি বিভাগের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। ∠ AOB একটি কোণ।

∠ AOB কোনকে সমত্রিখন্ডিত করতে হবে।

অঙ্কন : ∠ AOB কোণের O বিন্দুকে কেন্দ্র করে যেকোন ব্যাসার্দ্ধ OQ সমান একটি বৃত্তচাপ আঁকলাম যা OB বাহুকে Q বিন্দুতে এবং OA বাহুকে P বিন্দুতে ছেদ করে।

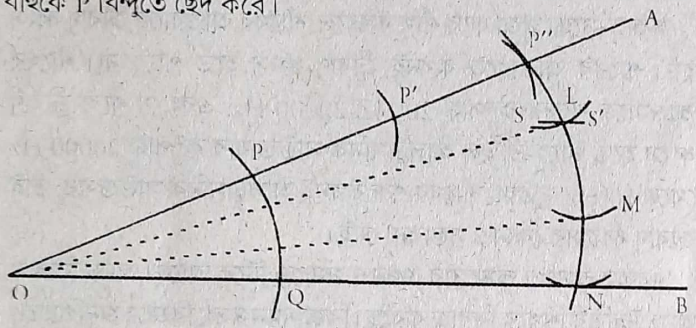

এখন ঐ একই ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে OA বাহুর উপর P P′ এবং P′P″ অংশ নিলাম যাতে OP = PP′ = P′P″ হল।

আবার O বিন্দুকে কেন্দ্র করে OP ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত চাপ আঁকলাম যা OA এবং OB বাহু দুটিকে যথাক্রমে P″ এবং N বিন্দুতে ছেদ করল।

আবার P″ বিন্দুকে কেন্দ্র করে PQ চাপের সমমান (দৈর্ঘ্যে) ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ আঁকলাম যা P″N চাপকে L বিন্দুতে ছেদ করল। অনুরূপভাবে একই ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে LM এবং MN বৃত্তচাপ অংশ কেটে নিলাম যাতে P″L = LM = MN হল।

বলা বাহুল্য N বিন্দু আগেই OB বাহুর উপর আঁকা হয়েছে। এবার OL এবং OM কে সরল রেখা দ্বারা যুক্ত করলাম।

ইঙ্গিত ∠AOB, ∠P″OL, ∠LOM এবং ∠MON তিনটি সমান ভাবে বিভাজিত হল।

(বি: দ্র: আমি যখন P″ কে কেন্দ্র করে PQ বৃত্ত চাপের সমদৈর্ঘ্যের বৃত্ত চাপ অঙ্কন করেছি তখন "CURVO METER" ব্যবহার করেছি। Curvometere এর সূচক দুটি S এবং S″ বিন্দু সৃষ্টি করেছে। ঐ S, S″ কে সরল রেখা দ্বারা যুক্ত করলে উহা L বিন্দুতে P″N চাপকে ছেদ করে।

এই কারণেই আমি P″L কে PQ বৃত্ত চাপের সমমানের বৃত্তচাপ বলেছি। অর্থাৎ PQ এর দৈর্ঘ্য P″L এর দৈর্ঘ্যের সমান।

CURVO METER কি?

CURVO METER আমার নিজের সৃষ্টি একটি দৈর্ঘ্য পরিমাপক যন্ত্র যার সাহায্যে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায়।

ইহা এক বৃত্তাকার মেটাল তার। তারের উপর দুটি সূচক আছে যা ইচ্ছামত নড়ান যায়। আবার বৃত্তাকার তারটিকেও ইচ্ছামত ছোট বা বড় বৃত্তের আকার দেওয়া যায়। যন্ত্রটিকে একটু ভালভাবে তৈরি করলে সকলেই ব্যবহার করতে পারব।

আমার সৃষ্টি CURVO METER এর চিত্র নীচে দিলাম।

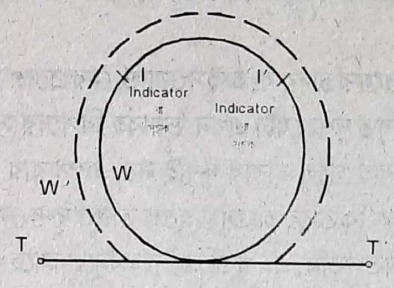

একটি স্টিল তার (ভাল স্থিতিস্থাপক) ফাঁস এর সাহায্যে W বৃত্তাকার করা হয়েছে। তারের দুই প্রান্ত TT′ কে টেনে বৃত্ত ছোট এবং TT′ ভিতরের দিকে টেনে বৃত্ত বড় করা যায় এবং সূচক বা Indicator দুটি I, I′ কে ইচ্ছামত কাছে বা দূরে সরান যায়।)

প্রমাণ : কাল্পনিক সরলরেখা দ্বারা P″ L, LM এবং MN যুক্ত করা হল এবং P″ L = LM = MN। যেহেতু এরা প্রত্যেকেই সম বৃত্তচাপের জ্যা।

এখন Δ P″OL এবং Δ LOM এর মধ্যে P″O = OL = OM একই বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ। আবার P″ L = LM সম বৃত্তচাপের জ্যা। অর্থাৎ Δ P″OL এবং Δ LOM এর

PO″ = OM এবং OL সাধারণ (common) বাহু এবং P″L = LM (বাহু)

∴ Δ P″OL ≅ Δ LOM

∴ ΔP″OL = Δ LOM

আবার অনুরূপে Δ LOM এবং Δ MON কে সর্বসম প্রমাণ করা যায়। সুতরাং Δ LOM এবং Δ MON এর

∠LOM = ∠MON

∴ ∠P″OL = ∠LOM = ∠MON

অর্থাৎ ∠P″OL = ∠LOM = ∠MON = 1/3 ∠AOB প্রমাণিত হল।

অনুসিদ্ধান্ত : (1) সমকেন্দ্রিক বৃত্তগুলির কেন্দ্রে কোন কোণ অঙ্কিত হলে কোণের দ্বারা ছিন্ন বৃত্ত চাপগুলির মধ্যে একটি অনুপাত সৃষ্টি হয়।

(2) চাপ এবং বাহুগুলির মধ্যেও অনুপাত সৃষ্টি হয়।

যেমন এখানে OP x P″N = OP″ x PQ

(3) 40° পর্যন্ত কোণকে সমভাবে বিভাজিত করতে সাধারণ কম্পাসের সাহায্যে করা যাবে। যদিও সামান্য ত্রুটি আসতে পারে তা নগণ্য। কারণ গণিতে সূক্ষ্ম চিন্তায় জ্যা কখনও বৃত্তচাপের সমান হতে পারে না। এক্ষেত্রে বৃত্তচাপ এবং জ্যা এক সমান হয়ে যায় (সাধারণ দৃষ্টিতে)।

— আনন্দমোহন ভট্টাচার্য্য

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। ফোন : ২৫৮০-৮৮১৬; ৯৪৭৪৩৩০০২২।

সম্পাদক মণ্ডলী— সুবর্জিৎ পাল, পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), শমিত কর্মকার, বিজয় সরকার, সুবর্জিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা। ফোন: ৯২৩১৬৭৫২৩৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক– শিবপ্রসাদ সরদার। *(ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)*

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.